OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 34
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 256 - 265
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 256 - 265
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

পুরুষতান্ত্রিকতার পেষণে নারীর স্বকীয়তা বিসর্জনের কাহিনী : সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ‘দহন’

ড. সুরঞ্জনা জানা
Email ID: suranjana.jana721467@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
বিকারগ্রস্থ, প্রথাসর্বস্ব, দগ্ধ, অন্তর-মোথিত, স্বাধীনচেতা, ভোগসর্বস্ব, পুরুষতান্ত্রিক, কর্তব্যবিমুখ, কর্তাব্যক্তি, অন্তর্দহন, পিতৃতন্ত্র, পৌরুষত্ব।

Abstract
The contemporary world is forging ahead, cloaked in the guise of modernity. Our daily lives are now governed by advanced technology and sophisticated intellectual concepts. Yet, in a true sense, we seem unable to become truly modern. While we are thoroughly enmeshed in external ostentation and glamour, deep within, we continue to harbor a mindset rooted in the archaic customs of a bygone era. We remain unable to truly liberate ourselves from the shackles of patriarchy; indeed, our daily existence continues to be dictated by it. The identity of a woman—encompassing her body, mind, soul, and individuality—is frequently neglected and violated. And our society, while paying lip service to the rhetoric of equal rights, invariably turns a blind eye when the moment of truth arrives. Suchitra Bhattacharya stands as a masterful interpreter of the female psyche. Through her literary works, she has repeatedly brought to the fore the stories of women who, amidst a dysfunctional process of social change, have at various times risen up as voices of protest. Her novel ‘Dahan’ (The Burning) tells the story of just such a woman. It centers on two women: Ramita and Jhinuk. When Ramita was assaulted by four young men at a Metro station, and while the crowd of onlookers remained mute and passive—with no one stepping forward to intervene—it was Jhinuk who fought alone to save her. Defying both society and her own kin, she plunged single-handedly into the fray to defend a woman's dignity. She even waged a solitary battle against the police and the legal system. Even when the world around her turned hostile, she did not waver an inch from her steadfast resolve. The very people she had relied upon to support her decision—her family, her relatives, and even the man she loved—eventually withdrew their support. Thus, she fought entirely alone for the girl she had saved; yet, even that girl's family failed to endorse such a woman's act of protest. It is rarely possible to sustain a struggle for long without the support of the wider world. The defiant young woman—Jhinuk—could not do so either. Ultimately, Jhinuk, too, was defeated by the dysfunctional and regressive social mindset. Her heart was left scorched and scarred, while the perpetrators went unpunished. In the end, Jhinuk was compelled to bow down before the prevailing social order; through the institution of marriage—which served as

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 34
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 256 - 265
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

a set of shackles—her rebellious spirit was utterly crushed. Suchitra Bhattacharya has brought to light incidents from our own familiar milieu—starkly exposing them for all to see—and has thereby signaled the need for a transformation of our convention-bound social order.

Discussion

সুচিত্রা ভট্টাচার্য (১৯৫০-২০১৫) হলেন বিশ শতকের সত্তরের দশকের একজন বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক। বিশেষত নারী মনস্তত্ত্বের সার্থক রূপকার। জন্ম ভাগলপুরে, তবে শিক্ষাজীবনের বেশিরভাগটাই অতিক্রান্ত হয়েছে দক্ষিণ কলকাতায়। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত সেই ছোটবেলা থেকে। নারী হয়ে নারীর জীবনের নানান ঘাত-প্রতিঘাত ও যন্ত্রণাকে তিনি তুলে ধরেছেন বারবার তাঁর সাহিত্যের পাতায়। সাহিত্য হল সমাজের দর্পণ। তাই, সমাজে ঘটে যাওয়া ঘটনার অভিজ্ঞতাই সাহিত্যে ভাষারূপ পায়। 'দহন' উপন্যাসটিও সেই রূপ সমাজ-অভিজ্ঞতারই ফসল।

'দহন' উপন্যাসটির প্রকাশকাল জুলাই, ১৯৯৮। উপন্যাসে বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে প্রকাশক প্রচ্ছদপটে একপ্রস্থ ধারণা দিতে বলেছেন, 'দহন শুধু বিশেষ এক বীরাঙ্গণার কাহিনী নয়, টালিগঞ্জে মেট্রো স্টেশনের চত্বরে চারজন যুবকের অশ্লীল থাবা থেকে এক গৃহবধূকে বাঁচাতে যে কিনা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দুষ্কৃতীদের উপর, থানা-পুলিশ কোর্ট কাছারি পর্যন্ত দৌড়ঝাঁপ করতেও যার দ্বিধা ছিল না, আবার, সাহসিকতার অভিনন্দনের রেশ ফুরোতে-না ফুরোতেই যে কিনা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছিল, কত ধরণের চাপ নিষ্ক্রিয় আর তুচ্ছ করে দিতে উদ্যত নারীর এই প্রতিবাদ, এমনকী লাঞ্ছনাকেও। এ উপন্যাস একইসঙ্গে এই সময়ে আর এই সমাজে নারীস্বাধীনতার প্রকৃত চেহারাটারও উন্মোচন, নপুংসক ও ঠুনকো মূল্যবোধের বিশ্লেষণ। সাম্প্রতিক একটি ঘটনা এ কাহিনীর প্রেরণা।' (উপন্যাসের প্রচ্ছদপটে উল্লিখিত উপন্যাস প্রকাশকের ক্ষুদ্র বিষয়সংক্ষেপ)

'দহন' উপন্যাসটির কাহিনীসূচক ১৯৯২ সালে রবীন্দ্র-সরোবরে মেট্রো স্টেশনে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা। চার-পাঁচটি ছেলে একটি অবিবাহিত মেয়েকে ঘিরে ধরে এবং জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। মেয়েটির চারিদিকে ছিল অনেক পথচারী কিন্তু কেউই প্রতিবাদ করেনি কিংবা রক্ষায় এগিয়ে আসেনি। মেয়েটির সম্ভ্রম রক্ষা করেছিলেন এক সাংবাদিক ও ফিল্মমেকার, অনন্যা চক্রবর্তী। সুচিত্রা ভট্টাচার্য এই ঘটনাকে বিষয় করে কিছুটা কল্পনার খাদ মিশিয়ে এমন এক সুন্দর উপন্যাস আমাদের উপহার দিয়েছেন।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য সামাজিক দায়বদ্ধ শিল্পী হিসেবে সমাজের কোলে লালিত নারীর অন্তর-মোথিত হাহাকারকে সাহিত্যের অঙ্গ করে নিয়েছিলেন। তাঁর 'দহন' উপন্যাস প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন—

> "এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতি মেয়েদের অনেক অভিমান আছে। তাদের কিছু সমস্যা আছে, যন্ত্রণা আছে। একজন মহিলা হিসেবে আমার তো অন্য নারীর কথা ভাবাই উচিত।"[১]

এবার আসা যাক উপন্যাসের মূল বিষয়ে। উপন্যাসে প্রবেশ করা মাত্রই একটি দৃশ্য দেখি, যেটি হল, টিভিতে নায়ক-নায়িকার নাচগানের আকর্ষণীয় দৃশ্য। যেখানে মেয়েটির শরীরের অধিকাংশই অনাবৃত। আর গানের সুরের সঙ্গে সঙ্গে নায়ক নায়িকার পিঠ, বুক, উদর, নিতম্ব ও কোমরে তাল ঠুকছে। এই দৃশ্যে নারীকে পুরুষের ভোগ্যসামগ্রী করে উপস্থাপিত করা হয়েছে। তাই, নারীর শরীর এতটা উন্মুক্ত করতে হয়েছে, যাতে পাবলিক আরও বেশি আকর্ষণীয় হতে পারে। এই প্রথম অনুচ্ছেদের দৃশ্য দেখে আর বিশেষ কিছু বলার না থাকলেও একটা কথা বলতেই হয়, তা হল- পুরুষতান্ত্রিকতার নগ্নরূপকে লেখক আলতো খোঁচা দিয়ে আপনার অভিপ্রায়ের দিক নির্দেশ করেছেন।

উপন্যাসে দুটি প্রধান নারী চরিত্রকে কেন্দ্র করে কাহিনী আবর্তিত হয়েছে – এক - রমিতা, দুই - ঝিনুক। এই দুই নারীই চরমভাবে পুরুষতান্ত্রিকতার স্বীকার। প্রথম আসি রমিতা প্রসঙ্গে - সে মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান এবং পরে হয় রক্ষণশীল ও প্রথাসর্বস্ব পরিবারের পুত্রবধূ। যথেষ্ট সুন্দরী ও নিজেকে আগাগোড়া পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখতে সে ভালোবাসে। তার বাবার বাড়ির পরিবেশ সম্পূর্ণ পৃথক এই শ্বশুরবাড়ির মানুষজন। সেখানে এক স্বামী ছাড়া সকলেই যেন অজানা। তবে, বিয়ের প্রথম পর্বের এই জড়তা কাটিয়ে ওঠার পর সকলের থেকেই সে যথেষ্ট স্নেহ-ভালোবাসা পাচ্ছিল,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 34
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 256 - 265
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তথা, পলাশের বাবা-মা-দাদা-বৌদি সবার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। যাদেরকে ছ'মাস আগে চিনত না, তারাই এখন আপনারজন হয়ে উঠেছে। অথচ যেখানে জন্ম নিল, যাদের সাহচার্যে বেড়ে উঠল, তারাই যেন ঝাপসা হতে লাগল। রমিতার মনের কোণে জেগে উঠল চাপা দীর্ঘশ্বাস—

> "কোথা থেকে কোথায় যে চলে যায় মেয়েদের জীবন! দু একটা ছোটখাটো যোগাযোগ, একটা সামাজিক অনুষ্ঠান, মাত্র কয়েকমাস একত্রে বাস করার অভ্যাস, তাতেই কত চিন্তাভাবনার বদল ঘটে যায়! পলাশের ভাল লাগা মন্দ লাগা, পলাশের পরিবারের প্রত্যেকের পছন্দ অপছন্দ অনিবার্যভাবে প্রতি মুহূর্তে স্মরণে আসে আজকাল। এই কি বন্ধন!"[২]

অর্থাৎ, যে মেয়েটি বাবার বাড়িতে স্বচ্ছন্দে নিজের জগতকে প্রাধান্য দিতে পেরেছিল, বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি প্রধান হয়ে উঠল। শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামী এরাই প্রাধান্য পেল। কেবল গুরুজনদের সেবা প্রদান ও সন্তান জন্ম দেওয়াই তার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল। এ যেন মনে করিয়ে দেয় বৈদিক যুগের বর্বর পুরুষতান্ত্রিকতাকে, যেখানে নারীকে দেখা হত পুত্র সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র এবং স্বামীর পরিবারের দাসী হিসেবে। তাই, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক সুকুমারী ভট্টাচার্য পুরুষসমাজের বিরুদ্ধে প্রশ্ন রেখেছেন—

> "বিবাহে বধূ বরের তুলনায় নিকৃষ্ট; স্বামীর পরিবারের প্রতি তার প্রচুর কর্তব্য; কিন্তু তার পরিবারের প্রতি স্বামীর কোনও কর্তব্য নেই। সে শুধু স্বামী ও সন্তানের সেবা করে না, শ্বশুরবাড়ির সব আত্মীয়দেরই সেবা করে। তাকে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ থাকতে হবে, না হলে তার শক্তিক্ষয় হয়। প্রশ্ন করার বাসনা হয়, এ কোন্ শক্তি যা শুধুমাত্র অবরোধে থাকলেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়?"[৩]

রমিতা নামী স্বাধীনচেতা মেয়েটিও এই জঘন্য সামাজিক প্রথার পুতুলে পরিণত হয়েছিল। যার আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা - বাসনা শ্বশুরবাড়ীর আবর্তে তলিয়ে গিয়েছিল। এমনকি পোশাক - আসাক ব্যবহারেও মাণদণ্ড নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। কখনও শ্বশুর বাধা দিয়েছিল, কখনও বা স্বামী পলাশ। মাসতুতো ননদের বিয়েতে লাহেঙ্গা চেলি পরে গেলে শ্বশুর ক্রুদ্ধ হয়ে শাশুড়ীর কাছে অভিযোগ জানান—

> "...কাসুন্দের চৌধুরী বাড়ির একটা ইজ্জৎ নেই। বনেদী বাড়ির বউ ওরকম একটা পিঠ খোলা পোশাক পরে বিয়েবাড়ি যাবে!"[৪]

এটিও একপ্রকার নারীর স্বকীয়তায় হস্তক্ষেপের দ্বারা তার কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা। বারবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে সমাজে তুমি বাস করছ, সেখানে পুরুষের রুচি-অরুচিই শেষকথা। আসলে আমাদের নির্লজ্জ নগ্ন পুরুষসমাজ মঞ্চে কিংবা অভিনয়ের জগতে নারীর উন্মুক্ত রূপ দেখতে লালায়িত হলেও নিজের বাড়ির মেয়েটির প্রতি যত বেড়াজালের বন্ধন। নিজের চরিত্র কলুষিত হলেও অন্যের প্রতি আঙ্গুল তুলতে পিছপা হয় না রক্ষণশীল কর্তা-ব্যক্তিরা।

নিষ্পাপ সরল মেয়েটির জীবনে ঘটে যাওয়া একটি দুর্ঘটনা আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কদর্য রূপকে আরও স্পষ্ট করেছে। মেট্রোস্টেশনে চারজন যুবক রমিতাকে ঘিরে ধরে তার যৌবনে থাবা বসাতে চায় কিন্তু পথচলতি জনতা ভুলে যায় এগিয়ে আসতে মেয়েটিকে রক্ষা করতে। যেন প্রত্যেক ব্যক্তি দৃষ্টিহীন দর্শক, যারা কেবল পৃথিবী দখল করে আছে কর্তব্যবিমুখ হয়ে। একটি মেয়ে ভীড় থেকে উঠে এসে রক্ষা করেছিল রমিতাকে। রমিতার দোষ কোথায়? আমাদের জানা নেই। কিন্তু পুরুষজাতি ঠিক দোষ খুঁজে বের করে নিয়েছিল।

একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা বদলে দিল রমিতার রঙিন সুন্দর জীবন। বনেদী শ্বশুরবাড়ির লোকজন ভোল পাল্টে নিল। এমনকি তার সরকারী ইঞ্জিনিয়ার স্বামী সে কিছুদিন নিশ্চুপ থাকলেও বেশিদিন তার বর্বরতাকে লুকিয়ে রাখতে পারেনি। রমিতার অন্তর্দহন যখন অসহ্য হয়ে উঠেছিল তখন মেরুদণ্ডহীন স্বামীর কাছে তার খানিক বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে চাইলে পলাশ হৃদয় নিঙড়ে বের করে আনে আক্রোশ—

> "পলাশের চোখ ও সহসা কুটিল, - কিডন্যাপিং কেস দিলে তোমার খুব মজা লাগে না পুরনো আশিকরা তুলে নিয়ে যাচ্ছে..."[৫]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 34
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 256 - 265
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পলাশের এমন বাক্যবাণে রমিতার ঘেন্না দ্বিগুণ বেড়ে যায়। কেবল এই কথাতেই তার পৌরুষত্ব দমে না, রাস্তার ছেলের মত ঘরের স্ত্রীর উপর বর্ষণ করে চলে পৌরুষ—

> "পোড়া কাঠের মতো পড়ে থাকা শরীরটার ওপর পৌরুষ বর্ষণ করে চলেছে পলাশ। উন্মাদের মত বিড়বিড় করে চলেছে, দেখি কোন শ্রবণা সরকার বাঁচাতে পারে তোমাকে।"[৬]

স্বামী, একজন বিবাহিতা নারীর আশা-ভরসা, ভালোবাসা কিংবা আবেগ প্রকাশের নিরাপদ আশ্রয়। একজন পিতা তাঁর অন্তরের সবচেয়ে মূল্যবাণ সম্পদস্বরূপ কন্যাসন্তানটিকে অন্যএকজন পুরুষের কাছে নিরাপদে থাকার আশা নিয়ে নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু এই কি তার নমুনা? পৃথিবীতে কত-শত নারী এরূপ বর্বর স্বামীর দ্বারা শারীরিক ও মানসিকভাবে নিয়ত ধর্ষিতা হচ্ছে কেই বা তার খোঁজ রাখে। নিভৃতে কেটে যায় কেবল মানিয়ে নিয়ে এবং মেনে নিয়ে জোড়াতালি দিয়ে মেয়েদের জীবন।

পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার যারা স্বীকার হয়েছে, অর্থাৎ যে নারী পুরুষের নিষ্ঠুর অত্যাচারের বলী হয়েছে তারাও একদিন হয়ে ওঠে নির্মম অত্যাচারী। যেমন করে রমিতার শাশুড়ি, জা ও অন্যান্য মহিলা আত্মীয়রা তার উপর অমানবিক আচরণ করেছিল, তা আসলে পুরুষের পূর্বে করা বর্বরতার পুনরাবৃত্তি ঘটানো। সমাজ আধুনিক হলেও এমন মানসিকতার মৃত্যু ঘটেনি। অথচ মেয়েরা আধুনিক সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে জিন্স পরেছে, বিউটিপার্লার যাচ্ছে, স্লিপলেশ ব্লাউজ পরে নিজেকে আরও আধুনিকা প্রমাণ করতে চাইছে - আসলে সবই আধুনিকতার খোলশ, ভেতর পুরোই ফাঁপা। যাদের মনটাই কলুষিত, আধুনিকতার সেখানে পৌঁছাতে পারে না। তথাকথিত আধুনিক কিন্তু মনের গভীরে রক্ষণশীলতার কালো অন্ধকার। তাই, রমিতা শ্লীলতাহানী হলে তার চরিত্রের দিকেই আঙুল তোলা হয়। তার মাসি শাশুড়ি বলেন—

> "মেয়েদের নিজেদের সম্মান নিজেদের হাতে। কোর্ট কাছারিতে গিয়ে, একগাদা লোকের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের অপমানের কথা ঘোষণা করলে এমন কিছু সম্মান বৃদ্ধি হয় না। নিজেদেরই সামলে সুমলে চলতে হয়। মহাভারতে দ্যাখোনি, দ্রৌপদীকে রাজসভায় এনে দুর্যোধনরা যে কাণ্ডটা করল, অত বড় বীরেরা সব সভায় বসে, কেউ কোন প্রতিবাদ করতে পেরেছে? ..."[৭]

অর্থাৎ ভদ্রমহিলার কথায় যুগে যুগে নারীরা এমন অপমানিত হয়েছেন এবং মেনে নিয়েছেন। মহাভারতে দুঃশাসন দ্রৌপদীর সম্ভ্রম লুট করতে চেয়েছিল কিন্তু তাঁর পাঁচজন স্বামী শ্রেষ্ঠ বীর হয়েও তা আটকাতে পারেননি, মেনে নিয়েছেন; যদিও পরে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল এই ঘটনা। পরোক্ষে রমিতাকে সমস্ত দায় মাথায় নিয়ে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। রমিতা প্রতিবাদ করতে চেয়েও পারেনি। পরিবর্তে কুঁকড়ে যেতে হয়েছে, আবদ্ধ করতে হয়েছে ঘরের নিভৃত অন্ধকারে। স্বামী ও তার পরিবারের সকল অন্যায়-অবিচার সহ্য করতে হয়েছে নীরবে। লেখিকা নিস্তেজ রমিতার সঙ্গে তুলনা করে লিখেছেন—

> "আকাশের চাঁদ নেই। রাস্তার নিতন বাতিগুলো নিভে গেছে কখন। অমাবস্যার অন্ধকার গিলে ফেলেছে পৃথিবীকে। নিদালির মায়ায় ঘুমিয়ে পড়েছে বিশ্বচরাচর।"[৮]

রমিতার অন্তরসত্তা বারবার মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছে, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। দায়িত্ববান পুরুষ পলাশ চিরদিনের জন্য রমিতার নিজস্বতাকে দমিয়ে রাখতে বীজ বপন করে দিয়েছে তার গর্ভে। আর ফলশ্রুতিতে রমিতা সন্তানের পিতৃপরিচয় হারানোর ভয়ে সমস্ত প্রতিবাদী মানসিকতাকে বলী দিতে বাধ্য হয়েছে তথাকথিত আধুনিক পুরুষের পায়ে। তাই, আদালতের বয়ান বদলে যায়, স্বামী - শ্বশুরের শেখানো বুলি আউড়ে যায়, অপরাধীদের চিনতে অস্বীকার করে। রমিতার এ হেন আচরণে লেখিকা উপমা হিসেবে আনেন—

> "ভীতু কুকুরটা গাছের গোড়ায় কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে পড়ল। ভিজবে আজীবন।"[৯]

রমিতারও প্রতিবাদী সত্তা একপ্রকার ভয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, যার জন্য অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করে নিয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে আজীবন যন্ত্রণায় দগ্ধ হবে তার হৃদয় এবং আত্মমর্যাদা হারিয়ে জীবন্ত লাশ হয়ে দিন কাটাতে হবে।

রমিতা চরিত্রের বিপরীত হল ঝিনুক ওরফে শ্রবণা সরকার। উপন্যাসে লেখিকা তাকে আধুনিক মনন নিয়ে গড়ে তুলেছেন। কোনো কাপুরুষতা তাকে গ্রাস করতে পারেনি। সর্বদা নিজের ভাবনাতেই অটুট থেকেছে। তার মত অন্যায়ের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 34
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 256 - 265
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রতিবাদ করতে কাউকে দেখা যায় নি। মেয়েটি বেশ সাবলীল। একটি স্কুলে বাচ্চাদের দিদিমণি সে। নিজের পড়াশোনা শেষ করে নিছক ঘুরে বেড়িয়ে আয়েষি জীবন সে অতিবাহীত করেনি, বরং সর্বত্র সংগ্রাম করেই নিজেকে জিতিয়ে নিতেই তার আগ্রহ বেশি। বন্ধুরা তার চাকরি পাওয়া নিয়ে যখন ঠাট্টা করে তখন সে হতাশার সুরে বলে—

> "তোরা শুধু আমার চাকরি পাওয়াটাই দেখলি, পরিশ্রমটা তো আর দেখলি না!"

অর্থাৎ দুধের বাচ্চাদের স্কুলে শিক্ষকতা করে তার সুখ নেই কিন্তু তবুও হার মানে নি। পরিশ্রম অনেক, তা সত্ত্বেও পিছিয়ে আসে নি। কেন না, কারুর ওপর নির্ভর করে জীবন কাটানোতে তা তার প্রবল আপত্তি। তাই, যত কষ্টই হোক না কেন চাকরিটা সে করে চলেছে।

এটি তার জীবনের একটি দিক। অন্যদিকে বন্ধুদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করে ভালো সময় কাটাতে তার মন্দ লাগে না। কখনও কখনও বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে বেশ জমিয়ে আড্ডা মেরে আসে। আবার কখনও ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে কাটায় রোমান্টিক মুহূর্ত—

> "ছোট্ট একটা ঝড় উঠেছিল বিকেলে। আনসান ধূলোর সঙ্গে কয়েকটা বড় বড় দানার বৃষ্টি। তখন থেকেই মধ্য জৈষ্ঠ্যের দাপট অনেক মোলায়েম।
>
> ঝিনুক ফুটপাথ থেকে শুকনো একটা ডাল কুড়িয়ে আলগা মারল তূণীরের পিঠে, ..."[১০]

ঝিনুকের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের আর একটি দিক হল, প্রতিবাদী সত্তা। মেট্রো স্টেশনে রমিতা যখন চারজন অসভ্য যুবক দ্বারা শ্লীলতাহানির স্বীকার হচ্ছিল, তখন নির্দিধায় পিঠের ব্যাগ দিয়ে রক্ষা করেছিল। যদিও রমিতার স্বামী উপস্থিত ছিল, পথচারীদের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও নির্বাক দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। অথচ ঝিনুক, নিজে একজন মেয়ে, তারও ক্ষতি হতে পারত; এসব সাত-পাঁচ না ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দুষ্কৃতিদের ওপর। সেই মুহূর্তে একজন সুস্থ নাগরিক হিসেবে যা কর্তব্য করা উচিৎ, তাই, সে করে দেখিয়েছে। শুধু তাই নয়, রমিতাদের নিয়ে থানায় ডায়েরী করতে গিয়েছে। কতটা সাহসী না হলে স্রোতের বিপরীতে হেঁটে নিজের দায়িত্ববোধকে স্বীকৃতি দিতে পারে।

এই ঘটনা সচরাচর ঘটে না। ঝিনুক সাহসিকতার সঙ্গে লড়ে একজন নারীকে উদ্ধার করেছে কিছু শ্বাপদের হাত থেকে। স্বাভাবিকভাবেই হইচই পড়ে গেল। খবরের কাগজে ছবি বেরিয়ে গেল তার। আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব বেশ কয়েকদিন তাকে নিয়ে মাতামাতি করল, অভিনন্দনে ভরিয়ে দিল। তবে, দিনকতক পরেই সবার মুখোশ খুলতে শুরু করল। এক ঠাকুমা মৃণালিনী ছাড়া কেউই ঠিকমত সার্পোট করতে পারল না, এমনকি ভালোবাসার মানুষ তূণীরও না। আসলে প্রদীপের তলাতেই তো যত অন্ধকার। তাই, সমালোচনা পিছু ছাড়েনি তার। তার মা বারবারই ঝাঁঝের সঙ্গে বুঝিয়ে দেন, এমন কাজ করা ঠিক হয়নি—

> "সুজাতার চোখ কপালে, - বাহাদুরি নয়! একপাল গুণ্ডার সঙ্গে মারপিট করল! থানায় গিয়ে পুলিশদের দাবড়ে এল খবরের কাগজে কি এমনি এমনি ছবি ছাপিয়েছে!"[১১]

তাঁর এই রাগান্বিত বক্তব্য মৃণালিনীকে স্পর্শ করেছিল। তাঁর উত্তরে একজন সুনাগরিকের উচিৎ কর্তব্য বলে নাতনীর কাজকে সমর্থন করলেন—

> "চশমার কাচের আড়ালে মৃণালিনীর চোখ পলকের জন্যে জ্বলে উঠল, - ওদিন ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে এর থেকে কম আর কী করতে পারত একটা স্বাভাবিক মানুষের যা করা উচিত, ঝিনুক তো তাই করেছে।"[১২]

আবার, সেই মেয়েটিকে এতবড় বিপদ থেকে রক্ষা করল ঝিনুক তার পরিবার, স্বামী পলাশ কেউই এই কাজটিকে সমর্থন তো করলই না, বরং ঝিনুকের সংগ্রামকে দমিয়ে দিতে চাইল। কোনোরূপ সহযোগিতা করতে এগিয়ে এল না। ঝিনুককে তকমা দেওয়া হল 'বিশ্বপাকা' মেয়ে। ওই পরিবারে একমাত্র রমিতা ঝিনুককে গোপনে সম্মান জানিয়েছিল, তার প্রতি একপ্রকার শ্রদ্ধায় মাথা নত করতে চেয়েছিল; কিন্তু তা ওই পর্যন্তই। মনের এককোণে আশ্রয় দেওয়া ছাড়া এর বেশি করার ক্ষমতা ছিল না তার। স্বামীর পরিবারের সকলেই তার থেকে সবকথা গোপন করতে চাইতো, কিছু করতে বা বলতে গেলেও পলাশ দমিয়ে রাখত। পলাশের কথায়—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 34
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 256 - 265
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "ভদ্রলোকের ছেলেদের রোজ রোজ থানায় যেতে ভালো লাগে না।"[১৩]

একজন আদর্শ সুনাগরিক এবং শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়র এবং পরিবারের সকলেই আধুনিক মানসিকতাসম্পন্ন। তবে, এই কি তার নমুনা? আসলে সে পিতৃতন্ত্রের ক্ষুদ্র সংস্করণমাত্র। পিতার বনেদিয়ানা সে বয়ে বেড়াতে চায়। চারিদিকে সংকীর্ণ রক্ষণশীলতায় ঘেরা, কেবল বাহ্যিক আড়ম্বরে আধুনিকতার স্পর্শ। পলাশ পিতার সেই আদর্শ থেকে বেরিয়ে এসে নারীর অধিকারকে প্রতিষ্ঠা দিতে সে পারে না। তাই, রমিতা যখন ঝিনুকের প্রসঙ্গ টেনে এনে বলে—

> "ভাবতে আঁতে লাগছিল, ওই মেয়েটাই তোমার বউকে রক্ষা করেছে? তুমি যা পারোনি?"[১৪]

নারীর পৌরুষত্ব নিয়ে এমন খোঁচা দেওয়া পুরুষ সিংহ বারুদের মতো জ্বলে ওঠে। আর তখনই বেরিয়ে আসে পুরুষতন্ত্রের আসল রূপ—

> "বাহ, তোমারও দেখছি এখন অনেক বুলি ফুটেছে। সারাক্ষণ ওই ঝাঁসি রানির ছবি দেখে দেখে? হুঁহ, বীরাঙ্গনা! মিনিমাম ফেমিনিন ডিগনিটিটাও নেই। থানায় আবার পুলিশকে উপদেশ দিচ্ছিল কিডন্যাপিং চার্জটাকে ভালভাবে স্ট্রেস, দেওয়ার জন্য!"[১৫]

'ফেমিনিন ডিগনিটি' অর্থাৎ নারীর মর্যাদা - এই শব্দগুলোর অর্থই পলাশ ঠিক মত জানে না। তাহলে নিজের স্ত্রীকে শ্বাপদের মুখ থেকে রক্ষা করতে পারত, কেবল নির্বাক দর্শক হত না। আসলে পুরুষসমাজ নারীর উচিৎ কাজকে কখনোই সম্মান প্রদর্শন করতে চায় না। বরং সবসময় তাদের পায়ের তলায় দমিয়ে রাখতে চায়। সেই কারণেই ঝিনুকের এই কাজকে পলাশ কিংবা বিশ্বের কেউই সমর্থন করতে পারে না।

ঝিনুকের কর্মস্থল, সেখানে সকলেই মেয়ে, তারাও যেন তার দুঃসাহসিক কাজকে মন থেকে মানতে পারে না। দুরন্ত ছাত্রকে শাসন করতে গেলে হেডমিসট্রেস ঝিনুকেরই দোষ খুঁজে বের করে কমনীয়তার অভাব বলে জানান। অর্থাৎ ঝিনুক বড় মাপের এমন কাজ করে সুনাম অর্জন করায় কেউই তা সহ্য করতে পারে না। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁদের আচার-আচরণে। আসলে আমাদের সমাজ পুরুষের রীতি-নীতিকে মান্যতা দিতে শিখিয়েছে, সেখানে মেয়ে হয়ে পুরুষকে ছাড়িয়ে যাওয়ার ঘটনাতেই সবাই সহজে 'ব্যাটাছেলে' বলে তকমা দিতে পেরেছে; যেন ব্যাটাছেলেরাই এমন দুঃসাহসিক কাজের উপযুক্ত, মেয়েরা নয়। আসল কথা হল, আমরা এক বিকারগ্রস্থ সমাজে বেড়ে চলেছি, সেখানে ছোটো থেকেই পুরুষতন্ত্রের বীজ মন্ত্র কানে প্রবেশ করানো হয়, যার দরুণ মেয়ে কিংবা ছেলে নারীকে প্রাধান্য দিতে পারে না।

ঝিনুকের পারিপার্শ্বিক জগৎ তথা পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও কর্মস্থলের প্রত্যেকের কাছ থেকে যখন 'ব্যাটাছেলে', কিংবা 'পাকামেয়ে' এমন বিশেষণ শোনে তখন তার মন বিষণ্ণে ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। শান্তির নীড় হিসেবে আশ্রয় নিতে ছুটে আসে ঠাম্মা মৃণালিনী দেবীর কাছে এবং জানতে চায় সত্যিই কি তার মেয়েটিকে উদ্ধার করা খুব ভুল হয়েছিল? যার দরুন সকলেই তার শান্তির ঘুম কেড়ে নিতে চায়। তার উত্তরে মৃণালিনীদেবী খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দেন—

> "মৃণালিনীর হাসি নিবে এল, - যতটা দেখতে পায় তাই দিয়েই বিচার করে। জলের মাছ যেমন জলের বাইরে মুখ তুললেও চতুর্দিক সম্পূর্ণ দেখতে পায় না, আমরাও সে রকম। আঁশের মত সংস্কার লেগে আছে গায়ে। আর সংসার হল সেই জল, যেখানে আমরা মাছেদের মতো খেলে বেড়াই। রোজ যা দেখছি তার বাইরে কিছু দেখলে আমরা সেটাকে মানতেই পারি না। গণ্ডারের মত তেড়ে যাই। নিজেদের সংস্কার দিয়ে দেগে দিয়ে বলি, এটাকে বলে পুরুষালি, এটাকে বলে মেয়েলি।"[১৬]

এই হল সমাজ-সংসার, আর এটি তার আসল নগ্নরূপ। যেখানে মানুষ আংশিক দেখেই বিচার করে। একপ্রকার সংস্কার গায়ে মেখেই জীবনচর্যা পরিচালনা করে চলেছে। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী পুর্বপুরুষ যা করে এসেছে বর্তমান প্রজন্মও তাই করবে— এটাই যেন প্রত্যেকের প্রত্যাশা। অর্থাৎ বিশ্ব সৃষ্টির পর পুরুষরা যেমন করে নারীদের ব্যবহার করত, পায়ের তলায় পিষে মারত, বর্তমানেও তাই দেখতে চায় জনগণ। এর ব্যতিক্রম হলেই সেটা তকমা পাবে সংস্কার বিরোধি এবং যতক্ষণ না কর্মকর্তাটিকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারবে ততক্ষণই করে চলবে তার সমালোচনা। আসলে এ সবই পচনশীল পুরুষতন্ত্রের নারীকে দমিয়ে রাখার নানান প্রয়াস।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 34
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 256 - 265
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কোনো কিছুই তবে দমিয়ে রাখতে পারেনি ঝিনুককে। নিজের পরিবার, বন্ধু-বান্ধব কিংবা নির্যাতিতার পরিবার তাকে সাহায্য না করলেও একাই লড়ে গেছে বিশ্বের পুরুষতন্ত্রের সঙ্গে। প্রয়োজনে থানা থেকে কোর্ট পর্যন্ত ছুটতে পিছপা হয়নি। 'ব্যাটাছেলে' কিংবা 'পুরুষালি মেয়ে' যে তকমাই দেওয়া হোক না কেন আপন স্বাতন্ত্র্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি কোনো প্রতিপক্ষ। সে বুঝেছিল এ লড়াই তার একার লড়াই। তাই, একাই কোর্টে গেছে, উকিলের সঙ্গে কেস নিয়ে নানান আলোচনা করেছে নিজেই। সেখানেই দেখা মেলে তার পূর্বপরিচিত শরৎ ঘোষাল বলে এক উকিলের সঙ্গে। যিনি বৃদ্ধাশ্রমে ডাক্তারি করেন, সেই সঙ্গে আদালতে নানা কেশ নিয়ে নাড়াচাড়াও করেন। তাঁর আণ্ডারে একটি কেস এসেছিল - একটি মেয়ে তার আগের স্বামীর কাছ থেকে খোরপোষ চাইতে গিয়েছিল, স্বামী খুব মেরেছে এবং লোকের সামনে শাড়ি পর্যন্ত খুলে অর্ধনগ্ন করে দিয়েছে। এতে কেস করলে স্বামীটি বেলে ছাড়া পায়। তাই, মার-খাওয়া স্ত্রীটি কেস তুলে নিতে এসেছে, যাতে স্বামী দয়া করে কিছু টাকা পয়সা দেয়। কী করুণ পরিস্থিতি মেয়েদের জীবনের? মেয়েটি কত সহজে অপমান ভুলে সেই স্বামীর থেকে টাকা পেতে চেয়েছে। এই প্রেক্ষিতে শরৎবাবুর মুখ দিয়ে লেখিকা বলালেন—

> "আমাদের মধ্যবিত্তদের এই দোষ। আগেই মেয়েটার সম্মান, শরীর এসব নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করে দিই। আরে বাবা, ছেলেরা নিজেদের দরকারে মেয়েদের শরীরের সম্মান বাড়ায়। নিজেদের দরকারেই আবার তাকে বিবস্ত্র করতে ছাড়ে না।"[১৭]

কী নৃশংস এই পুরুষজাতি, অথচ মুখে কতই না মিষ্টতা। অথচ ভেতরে লালন করে চলেছে অমানসিক বর্বরতা। মেয়েদের সতীত্ব, শুচিতার কোনোই মূল্য নেই তাদের কাছে, কেবল আছে ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা। এই কঠিন সত্যকে প্রতিষ্ঠা দিতে ঔপন্যাসিক শরৎ ঘোষালের মুখে বসালেন এমন নির্মম বাক্য—

> "আমরা ছেলেরা চাই বলে মূল্য আছে। আমরা না চাইলেই নেই। বেস্টিটিটা কী জানেন ম্যাডাম? আমার যে ছেলেটা জন্মাচ্ছে সেটা যে আমারই, মানে আমিই যে তার বাবা, সেটা নিশ্চিত করে রাখার একটা অস্ত্র। ও অস্ত্রটা আমরাই চালাই। আমি যে সম্পত্তি বানাব, টাকা জমাব, সেটা একটা কোকিলের ছানা এসে ভোগ করবে এতো হতে পারেনা!"

অর্থাৎ, এটা স্পষ্ট যে, মেয়েদের আসল মূল্য নির্ধারিত হয় বংশের উত্তরাধিকারী উৎপাদনের মাধ্যমে। এ যেন বৈদিক যুগের দেখানো পথই একবিংশ শতক নির্লজ্জভাবে বয়ে নিয়ে চলেছে। তখন মেয়েকে দেখা হত সন্তান- উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে, আর এখন বলা হচ্ছে উত্তরাধিকারী তৈরির মাধ্যম, কথাটার অর্থ একই, শব্দগুলো কেবল ভিন্ন। প্রাবন্ধিক সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর প্রবন্ধে নারীর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—

> "যদিও কোনও কোনও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে পত্নীকে যজ্ঞের পশ্চার্ধ (অবশ্যই পতি এই সঙ্গে পূর্বার্ধ বলে চিহ্নিত) বলা হয়। তাঁকে অর্ধেক বলার কারণ হল, এই যে যতদিন পত্নী না থাকে সন্তানলাভ ও ঘটেনা। সুতরাং পত্নীর আসল উপযোগ সন্তান প্রসব করায়।"[১৮]

সুতরাং, এটাই হল পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর মূল্য নির্ধারণের কার্যকরী পন্থা। সন্তান জন্ম দেওয়া, পিতৃ পরিচয় প্রদান ও সম্পত্তি রক্ষা – এসবের জন্য নারীকে টিকিয়ে রাখা হয়েছে, যদি বিকল্প কোনো পদ্ধতি দ্বারা এগুলি সম্ভব হত, তাহলে হয়তো সমাজে নারীর প্রয়োজন ফুরাত। বংশানুক্রমে সমাজ-মানুষ এই রকমই দেখে অভ্যস্ত, তাই, এর ব্যতিক্রমী কোনো ঘটনা ঘটলে পুরুষসমাজ সহ্য করতে পারবে কেন?

ঝিনুকের ভালোবাসার মানুষ তূণীরও যেন খুব একটা মেনে নিতে পারে নি তার এমন দুঃসাহসিক কাজকে। ঝিনুকের এমন কাজে যখন সবাই আনন্দিত এবং অভনন্দনে ভরিয়ে দিয়েছিল তাকে, তখনও তূণীরের মুখে মেলেনি তেমন উজ্জ্বলতার আভা। একটি সাধারণ ঘটনা হিসেবে ব্যাখ্যা করে চলে সে—

> "মেয়েরা তো জেনেটিকালি ভীতুই। তার মধ্যে একটা আধটা মেয়ে কোন সাহসের কাজ করে ফেললে..."[১৯]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 34
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 256 - 265
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আমাদের সমাজ আগে থেকেই ঠিক করে দিয়েছে নারী-পুরুষের কাজ। আর সেই কাজের ভিত্তিতে মেয়েকে কোমল আর ছেলেদের শক্তিশালী বিবেচনা করা হয় — এই রীতিই সমাজে প্রচলিত হয়ে আসছে আদিমযুগ থেকে। তাই, মেয়েরা তার সাহসিকতা দেখিয়ে কোনো দুঃসাহসিক কাজকর্ম করলে সমাজ তা সহজে মেনে নিতে পারে না।

আসলে প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় নারীকে স্বাধীন মনে করা হলেও পুরুষ কখনোই নিজেকে নারীর নীচে কল্পনা করতে নারাজ। বরং নারী পুরুষের দাসত্ব করবে, পণ্য হবে এটাই আকাঙ্ক্ষা করে পুরুষতন্ত্র। কিন্তু নারী আপনার স্বকীয়তাকে প্রাধান্য দিয়ে প্রতিবাদ করবে এবং তার নির্দিষ্ট লক্ষ্মণকে অতিক্রম করে যাবে পুরুষ কখনোই তা মানতে পারে না। তাই, দুই নারী— ঝিনুক, রমিতা, পাশবিক বর্বরতার স্বীকার হয়ে প্রতিকার চেয়ে আইনের দ্বারস্থ হলে, ঘরে-বাইরে থেকে নেমে আসে চাপের পাহাড়। আর চলতে থাকে যেকোনো ভাবে নারীর কণ্ঠরোধের প্রয়াস। দুইজন-নারীই চেয়েছিল দুষ্কৃতির শাস্তি হোক কিন্তু তাদের প্রতিবাদ প্রতিহত করেছিল নাগরিক সমাজ। বিত্তবান, ক্ষমতাশালীরা নিজের প্রভাব খাটিয়ে আইন-আদালত কিনে নিয়েছিল, ফলে অপরাধীরা নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছিল। পরিবর্তে ঝিনুককে প্রমাণ করেছিল 'ভদ্র ঘরের বেশ্যা' হিসেবে, যে চারজনকে খদ্দের হিসেবে ধরতে পারেনি বলেই প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে। এ কোন্ সমাজব্যবস্থাকে আমরা লালন করে চলেছি? একুশ শতকে নারী স্বাধীনতার বুলি আওড়ালেও তাদের স্বকীয়তাকে হরণ করে চলেছে বিকারগ্রস্থ নাগরিক সমাজ। যার দরুণ, রমিতা শত যন্ত্রণাকে হৃদয়ে লুকিয়ে রেখে শ্বশুর-স্বামীর দেখিয়ে চলা পথকেই অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছে। কেননা, প্রতিবাদ করতে চেয়েও বারবার পরাস্ত হয়েছে— কখনও শ্বশুরের থেকে শুনতে হয়েছে মেয়েরা নির্বোধ, আবার কখনও পোষাকের দোহাই দিয়ে তার চরিত্রের দিকেই আঙুল তোলা হয়েছে। ফলে, চারিদিকের প্রবল চাপে শামুকের খোলসের মধ্যে নিজেকে গোপন করতে একপ্রকার বাধ্য হয়েছে— এ আসলে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়ার দারুণ প্রতিশোধ।

লেখিকা উপন্যাসে আর একটি সত্য বেশ সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন— পুরুষ-সমাজ প্রয়োজনে তথা নিজের স্বার্থ রক্ষার্থে নারীকে ব্যবহার করে, তা সে যতই পছন্দের নারী হোক না কেন। তূণীরও করতে চেয়েছে। নিজের চাকরির প্রমোশনের জন্য বসের অপরাধী ছেলের কেস তুলে নিতে চাপ দিয়েছে, যাতে ক্যালিফোর্নিয়া যাওয়ার স্বপ্নও চরিতার্থ করতে পারবে। প্রথমে শান্ত গলায় ঝিনুককে বোঝাতে চেষ্টা করে বলল—

> "কার না কার নোংরা একটা কেসে এত বেশি নিজেকে জড়িয়ে ফেলা তোমাকে মানায় না ঝিনুক।"[২০]

এই কথা শুনে ঝিনুকের পায়ের তলার মাটি সরে গেল। সে এতদিন যে বিশ্বাস-ভরসার মায়াজালে তূণীরকে বেঁধে রেখেছিল, তা মুহূর্তেই মিথ্যে প্রমাণিত হল। ঝিনুক ভেবেছিল কেউ পাশে না থাকলেও তূণীর কখনও তাকে ছেড়ে যাবে না। হায় রে নারী হৃদয়! ভাবে এক আর হয় আর এক। তূণীর চাকরীর জন্য এতদিনের সম্পর্ক ও কেসের মধ্যে শর্ত বেঁধে দেয়। যদি কেস থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়, তবেই তাদের সম্পর্ক থাকবে নইলে নয়। তূণীর নিঃসংকোচ তীক্ষ্ণ গলায় জানায়—

> "তা হলে আমাকে অন্য কিছু ভাবতে হবে। তূণীরের মুখের একটি পেশীও কাঁপল না। আহত পৌরুষ লুকনো থাবা প্রকাশ্যে চাটতে শুরু করেছে, - হয়তো আমার পক্ষে আর সম্পর্ক রাখা সম্ভব হবে না। জীবন শুরু করার আগেই এত ঔদ্ধত্য আমার পক্ষে স্ট্যাণ্ড করা সম্ভব নয়।"[২১]

ছাই চাপা আগুন একটুতে হাওয়া দিতেই বেরিয়ে এসেছে। লেখিকার কথায়—

> "আদিম পুরুষ পুরোপুরি নগ্ন।"[২২]

অর্থাৎ পুরুষের স্বাভাবিক যে বৈশিষ্ট্য নারীর অমর্যাদা যা এতদিন মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে ছিল, তা একটু চাপে পড়তেই বেরিয়ে এল। আসলে পুরুষতান্ত্রিকতা নারীকে কখনোই স্বাধীনতা দিতে চায়নি, দেয়ও নি। নারী গৃহকোণে পর্দার আড়ালে আবৃত থাকবে এটাই চায় বর্বর পুরুষজাতি ও সমাজ। তারা চায় নারীর কণ্ঠরোধ করতে। সেই বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে রামায়ণ-মহাভারতের যুগ পেরিয়ে বর্তমানেও তা সমানভাবেই সক্রিয় থেকেছে। দেখা যায়, পুরুষ নারীকে রক্ষা করতে না পারলে অর্থাৎ নারী কোনো বর্বর পুরুষের দ্বারা আক্রান্ত হলে তার ফলভোগ করতে হয় নারীকেই। লাঞ্ছিতা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 34
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 256 - 265
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নারীকেই আজীবন বয়ে বেড়াতে হয় নানান গঞ্জনা ও মানসিক যন্ত্রণা। একটি প্রাণীও তার সমব্যথী হবে না - এটিই হল সামাজিক বিকারগ্রস্থতার চরম দৃষ্টান্ত।

বিত্তশালীরা প্রভাব খাটিয়ে কেসে জিতে যায় ঠিকই, ঝিনুককে নোঁয়াতে পারেনি। রমিতা যে সাহস দেখাতে পারেনি, ঝিনুক তার দিক থেকে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। অবশেষে তূণীর সেই কোম্পানী ত্যাগ করেছে এবং তাদের বিয়েও হয়েছে। এর পরেও একটি প্রশ্ন থেকে যায়-তূণীর কী সত্যিই বিয়ে করে আসল মর্যাদা দিতে পেরেছে? লেখিকার একটি উক্তি তা স্পষ্ট করেছে—

> "ওই দীর্ঘশ্বাস চেনে না পুরুষ। জানে না কত অভিমান অপমান আর যন্ত্রণা গোপন করে নারী ভালোবেসেছে তাকে। যুগযুগান্ত ধরে।
> পলাশ জানে না। তূণীরও জানবে না কোনোদিন।"[২৩]

নারীরা যুগে যুগে তার সখের পুরুষকে, ভালোবাসার মানুষকে পেতে ভোগ করেছে অনেক নরক যন্ত্রণা। কখনও কখনও প্রিয় মানুষটিই সেই যন্ত্রণার কারণ হয়েছে, তবুও হারানোর ভয়ে মনের গোপন কোণে সকল ব্যথাকে স্থান দিয়ে হাসিমুখে মেনে নিয়ে মানিয়ে নিয়েছে। যা পুরুষজাতি কখনও জানতে পারে না বা জানতে চায়ও না; কেবল আপন স্বার্থ চরিতার্থ করেই তৃপ্ত হয়। উপন্যাসে যেমন পলাশ ও তূণীর নিজের অবদমিত আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়ার পর ক্ষান্ত হয়েছে। এটাই পুরুষতান্ত্রিকতার নগ্নরূপ। ডেক স্পেণ্ডার 'Man Made Language' গ্রন্থের – একটি উক্তি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক—

> "ভাষা এবং প্রতিবেদন পুরুষতন্ত্রের সার্বিক নিয়ন্ত্রণে থাকায় পুরুষের ঐকান্তিক চাপে নারীর নিজস্ব বোধ নিষ্পেষিত হচ্ছে। নারীর ভাষা ও প্রতিবেদন সেজন্য ইপ্সিত মাত্রায় পৌঁছাতে পারে না।"[২৪]

সুচিত্রা ভট্টাচার্য সমাজ সচেতন শিল্পী। তাই, সমাজে ঘটে চলা নানান ঘটনাকে উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান দিয়ে আসল সমাজভাবনাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর 'দহন' উপন্যাসের কাহিনীটিও সমাজ থেকেই সংগ্রহ করা। প্রতিনিয়ত পুরুষের দ্বারা হাজার হাজার নারী যেভাবে দিনের পর দিন লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়ে চলেছে, সংসারের নামে অবদমিত করে রাখা হচ্ছে গৃহকোণে ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে আপন স্বকীয়তা— এই উপন্যাসটি হয়েছে তারই জ্বলন্ত প্রতিভাস।

Reference:

১. রাহা রায়, অরুনাভ, 'অপ্রকাশিত সুচিত্রা ভট্টাচার্য : লেখায় কখনও ফাঁকি দিই না', কলকাতা ২৪x৭ অনলাইন ডেস্ক, ২০ মার্চ ২০১৬
২. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, দহন, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা একাদশ মুদ্রণ-নভেম্বর, ২০১৫, পৃ. ১৯
৩. ভট্টাচার্য, সুকুমারী, প্রবন্ধ সংগ্রহ।। ১।।, প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০১২, পৃ. ৮৭
৪. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, দহন, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, একাদশ মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০১৫, পৃ. ২১
৫. তদেব, পৃ. ৫৭
৬. তদেব, পৃ. ৫৭
৭. তদেব, পৃ. ১৩৫
৮. তদেব, পৃ. ৫৭
৯. তদেব, পৃ. ১৫১
১০. তদেব, পৃ. ৬৭
১১. তদেব, পৃ. ৪২
১২. তদেব, পৃ. ৫৬
১৩. তদেব, পৃ. ৫৬

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 34
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 256 - 265
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১৪. তদেব, পৃ. ৫৬
১৫. তদেব, পৃ. ৫৬
১৬. তদেব, পৃ. ১১৬
১৭. তদেব, পৃ. ৬৬
১৮. ভট্টাচার্য, সুকুমারী, প্রবন্ধ সংগ্রহ।। ১।।, নারী ও নীরবতা, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০১২, পৃ. ১৬৯
১৯. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, দহন, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, একাদশ মুদ্রণ - নভেম্বর, ২০১৫, পৃ. ৬৮
২০. তদেব, পৃ. ১২৮
২১. তদেব, পৃ. ১৪৯
২২. তদেব, পৃ. ১৪৯
২৩. তদেব, পৃ. ১৭৪
২৪. ভট্টাচার্য, তপোধীর, প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ - ফেব্রুয়ারী ২০০৬, পৃ. ১৬৭